তারিখ ... 06 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

ছাত্রনেতৃত্বকে কেন সরকার ভয় পায়?

কালের পুরাণ

সোহরাব হাসান

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত আবুল পাকির জয়নুল আবেদিন (এ পি জে) আবদুল কালাম সর্বশেষ ২০১৪ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে এসেছিলেন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) ১১০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখানে এই বিশ্ববরেণ্য পরমাণুবিজ্ঞানী বলেছিলেন, বাংলাদেশের তিনটি বড় সম্পদ রয়েছে—অগ্রসরমাণ তরুণ প্রজন্ম, বিশ্ব-সমাদৃত তৈরি পোশাক খাত ও বিশাল জলরাশি। উন্নত ও সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পা রাখতে এসব সম্পদ বাংলাদেশের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৫টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০০ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে আবদুল কালাম আরও বলেছিলেন, বড় হতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। একজন তরুণ বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, প্রযুক্তি—যেকোনো পেশায় নিজেকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

কিন্তু বাংলাদেশ যে সেই কাজটি যথাযথভাবে করতে পারেনি, তার প্রমাণ যুগের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার অসংগতি। আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, তা না পারছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ তৈরি করতে, না পারছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে।

গত ২৮ জুলাই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬ নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বলেছিলেন, 'প্রতিবছর শ্রমবাজারে ১৪ লাখ তরুণ প্রবেশ করছেন, কিন্তু তাঁদের ৯০ শতাংশ অদক্ষ। প্রতিবছর হাজার হাজার তরুণ উচ্চশিক্ষা নিয়ে বেরোচ্ছেন, কিন্তু আমাদের শিল্পকারখানা কিংবা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যে দক্ষ জনবল দরকার, তাঁরা এর চাহিদা মেটাতে পারছেন না। ফলে বিদেশ থেকে আমাদের দক্ষ জনশক্তি আমদানি করতে হচ্ছে। জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়াসহ এই অঞ্চলের যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে ঋদ্ধ হয়েছে, তারা সবাই দক্ষ জনবল গড়ে তুলেছে।'

কয়েক বছর আগে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট সারা বিশ্বের শিক্ষিত বেকারদের ওপর যে প্রতিবেদন তৈরি করেছিল, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশেই শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি। আমরা তরুণদের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখাতে পারিনি, যে স্বপ্ন নিজেকে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী করে দেখতে পারে। আমরা তরুণদের সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারিনি, যে বন্ধন সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পারে। এ কারণেই দেখি তরুণদের একাংশ মাদকসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে, আরেক অংশ জঙ্গিবাদের আত্মবিনাশী পথে ধাবিত হচ্ছে। এর পেছনে বৈশ্বিক কারণ আছে স্বীকার করি; কিন্তু দেশীয় কারণটিও উপেক্ষা করার মতো নয়।

আমরা কি তরুণদের সেই স্বপ্ন দেখাতে পেরেছি, যে স্বপ্ন একজন তরুণকে দেশপ্রেমে, ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করবে? অনেকেই বলছেন, জঙ্গিবাদে দীক্ষিত তরুণদের মগজ এমনভাবে ধোলাই করা হয়েছে যে তাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ, মানবতা-দানবতার অনুভূতি লোপ পেয়েছে। হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র কেন সূচনাতেই সেই অপশক্তি ও তাদের নেপথ্যের হোতাদের প্রতিহত করল না? দিনে দিনে অনেক দেনা বেড়েছে। কার বা কাদের গাফিলতির কারণে একসময়ের পুঁচকে সন্ত্রাসীরা দানবে পরিণত হলো? কেন আমরা তরুণদের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলাম না?

বাংলাদেশের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, আমরা যাঁদের তরুণ বলি, যাঁদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে, সেই তরুণেরাই সব পরিবর্তনের অগ্রসারিতে ছিলেন। এই তরুণেরাই ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রবীণদের বিরোধিতা সত্ত্বেও। এই তরুণেরাই ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, উনসত্তরে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। সর্বোপরি এই তরুণেরাই ইতিহাসের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা—মুক্তিযুদ্ধে জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ভেবে বুক পেতে দিয়েছিলেন শত্রুসেনার গুলির মুখে। তারও আগে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন দোলাচলে ভুগছিলেন, তখন এই তরুণেরাই জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার কম কিছু তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বাধীনতার পর আবার এই তরুণেরা নব্বইয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আশির দশকের পুরো সময়টা তাঁরা মাঠ কাঁপিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলো যখন ঐক্যের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল, তখন এই তরুণেরাই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করে স্বৈরাচারের পতন অনিবার্য করে তুলেছিলেন। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁরা সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন নিয়ে নেতৃত্বের আসনে বসতে পেরেছিলেন বলেই। তাঁদের কেউ ছিলেন ডাকসু, কেউ চাকসু কেউ রাকসু কিংবা কেউ অন্য কোনো ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

পঞ্চাশের দশক থেকে দেশের প্রায় সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদই ছাত্রদের তথা তরুণদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পরও কিছুদিন সেই ধারা অব্যাহত ছিল; তারপর কী অদৃশ্য কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়, তরুণেরা নেতৃত্ব দেওয়ার স্বাভাবিক ও সর্বজনস্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। বেদনার সঙ্গে বলতে হয়, সামরিক শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন যথারীতি হতো। আজ যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্য সারিতে আছেন, তাঁদের অনেকেই জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্রনেতা। কিন্তু গত আড়াই দশকে পূর্বাপর গণতান্ত্রিক সরকারগুলো পরিকল্পিতভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে যে কোনোভাবেই ছাত্রনেতৃত্ব বা তরুণ নেতৃত্ব তৈরি করা যাবে না। এটি একটি প্রজন্মকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার শামিল। যে তরুণদের নিয়ে আমরা এত স্বপ্নের কথা বলি, যে তরুণদের নিয়ে গর্ব করি, সেই তরুণদের হাতে তরুণদের নেতৃত্ব দিতে কেন এত ভয়? স্কুল পর্যায়ে ছাত্র কেবিনেট করা হচ্ছে, যেখানে ছাত্ররাই নির্বাচন কমিশন করে, ছাত্ররাই প্রার্থী হয় ও ভোট দেয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দিতে বাধা কোথায়?

এ কথা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলেই শিক্ষাঙ্গনের সব সমস্যা রাতারাতি সমাধান হবে না। কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি হবে। ছাত্ররা নিজেদের সমস্যার কথা বলার জন্য প্রতিনিধি বা নেতৃত্ব বাছাই করার সুযোগ পাবেন। আমাদের বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্রনেতৃত্বকে কেন ভয় পাচ্ছেন? তাঁরাও তো একসময় ছাত্র সংসদগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আমাদের স্বাধীনতার বয়স ৪৫ বছর। কিন্তু সরকার, বিরোধী দল তথা রাজনীতিতে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা প্রায় সবাই পাকিস্তান প্রজন্মের। নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলন হয়েছে ২৬ বছর আগে। এখনো সেই আন্দোলনের নেতারা 'ছাত্রনেতা' বা 'হাফ নেতা' হিসেবে পরিচিত। দলে অনেকের পদবি সহসম্পাদকের মধ্যে সীমিত। গত ২৬ বছরেও তাঁদের বয়স বাড়ল না বা বাড়তে দেওয়া হলো না। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ রাজনীতিচর্চার অনুপস্থিতিতে একদল তরুণ যেমন জঙ্গিবাদে দীক্ষা নিচ্ছেন, আরেক দল সতীর্থদের খুনে হাত রাঙাচ্ছেন। গত সাড়ে সাত বছরে কেবল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৫৫ জন তরুণকে জীবন দিতে হয়েছে। বিএনপি আমলে ছাত্রদলও নিজেদের মধ্যে মারমারি করে অনেক তরুণের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। অথচ এরাই আমাদের সন্তান। এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ।

বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়নি এই ভয়ে যে বিরোধী দলের সমর্থক, অর্থাৎ ছাত্রলীগ ডাকসু, বাকসু, জাকসু, চাকসুতে নির্বাচিত হলে তাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করবে। বিএনপি ছিল সামরিক শাসকের ধ্যানধারণার দল। কিন্তু জনগণের কাফেলা থেকে উঠে আসা আওয়ামী লীগ কেন সেই পথ বেছে নিল? যেখানে বিরোধী দল মাঠেই নামতে পারে না, বিরোধী দলের সমর্থক ছাত্রসংগঠনটির নেতা-কর্মীরা পালিয়ে থাকেন, সেই অবস্থায়ও ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে আওয়ামী লীগ ভয় পাচ্ছে!

গণতন্ত্রের সিপাহসালাররা কেন তরুণদের মনের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছেন না? কয়েক দিন আগে ইউজিসির আহ্বানে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে জঙ্গিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব তৈরির সুযোগ কেন আমরা হাতছাড়া করছি? যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নিই যে দেশের নামকরা সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরোধী দলের সমর্থক ছাত্রসংগঠনই জয়ী হবে। তাতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হারানোর ভয় আছে বলে মনে হয় না। কেননা, সেখানে তাঁরা ছাত্রদেরই প্রতিনিধিত্ব করবেন; রাজনৈতিক দলকে নয়। বরং ছাত্র সংসদে বিরোধীদের শক্ত অবস্থান ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতাসীনেরা সম্ভবত ক্ষমতার ভারসাম্য নয়, চান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব।

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ছাত্ররাজনীতি থাকলে, নিয়মিত ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন হলে আজ যেসব ছাত্রসংগঠনের নামে সন্ত্রাসের কালিমা লেগে আছে, সেই সংগঠনগুলোও তা মুছে ফেলার সুযোগ পেত। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য হলেও তারা সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি থেকে বিরত থাকত।

● সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।
sohrabhassan55@gmail.com